অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 165-169
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.023

PASCHIMBANGA O ODISAR SIMANTABORTI ANCHALER SUBARNOROIKHIK BHASA O MISHRA SANSKRITI / পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সুবর্ণরৈখিক ভাষা ও মিশ্র সংস্কৃতি

SHREYA HALDER / শ্রেয়া হালদার
পিএইচডি গবেষক, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
Email: shreyahalder6@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:
সুবর্ণরেখা নদী, সুবর্ণরৈখিক ভাষা, মিশ্র সংস্কৃতি, বাংলা-ওড়িআ ভাষা, লোকসংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক সংহতি।

Abstract:

সুবর্ণরেখা নদী পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি ও জনজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগসূত্র। এই নদীকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে বাংলা, ওড়িআ, সাঁওতালি, মুণ্ডারী ও কোলীয় ভাষার সংমিশ্রণে একটি স্বতন্ত্র কথ্যভাষার বিকাশ ঘটেছে, যা 'সুবর্ণরৈখিক ভাষা' নামে পরিচিত। একই সঙ্গে এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি, ধর্মীয় আচার এবং উৎসব-পার্বণে বঙ্গ ও উৎকল সংস্কৃতির নিবিড় সমন্বয় লক্ষ করা যায়। এই প্রবন্ধে সুবর্ণরেখা নদীকেন্দ্রিক ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মিশ্র সংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস এবং সামাজিক সহাবস্থানের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে বালিযাত্রা, মকর উৎসব, বিষুব সংক্রান্তি, গাজন ও ডঙ্গা পূর্ণিমার মতো উৎসবের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সংহতির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলা ও ওড়িআ ভাষার পারস্পরিক প্রভাব এবং স্থানীয় কথ্যভাষার স্বাতন্ত্র্যও আলোচিত হয়েছে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, রাজনৈতিক সীমারেখা পৃথক হলেও সুবর্ণরেখা অববাহিকার মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনচর্চায় এক গভীর ঐক্য বিদ্যমান। ফলে সুবর্ণরেখা কেবল একটি নদী নয়, এটি সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বহুভাষিক ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক।

Discussion:

সুবর্ণ যার অর্থ সোনা। সুবর্ণরেখা অর্থাৎ সোনার রেখা। সুবর্ণরেখা নদীর উৎস ঝাড়খণ্ডের রাঁচির মালভূমি হাতিয়ার কাছে পিস্কা গ্রাম থেকে। প্রায় ৪৭৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটি বয়ে গিয়েছে ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার ভিতর দিয়ে। সুবর্ণরেখার নাম শুনেই মনে হয় এই নদীতে সুবর্ণ অর্থাৎ সোনা পাওয়া যায়। সত্যিই যেন এই নদীর বালিতে লুকিয়ে আছে সোনার কণা। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী এই নদীর তীরবর্তী গ্রামের লোকেরা সারাদিন বালি চালাচালি করে খুঁজে বার করেন সেই বালির কণা। সুবর্ণ রেখার বেশ কয়েকটি উপনদী আছে - খাড়কাই, কারফারি, কানাচি, রু রু, করবরি, সনজাই, গাড়া, শঙ্খ, দুলুং ইত্যাদি। এই নদীকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে রয়েছে তিনটি রাজ্যের মানুষের জীবনযাত্রা আবেগ ও ভালোবাসা। বাংলা, ওড়িআ, মৈথিলী ও হিন্দি মিশ্রিত হয়ে তৈরি হয়েছে সুবর্ণরৈখিক ভাষা। গড়ে উঠেছে মিশ্র সংস্কৃতি। সুবর্ণরেখার অনেক নাম। যেমন- সুবন্নখা, শবর নেকা, শবর রাখা, শবর নেখা, সাবর নেকা ইত্যাদি। শবরী ভাষায় 'নেকা' হল নদী বাচক। এই নদীর উৎস মুখে একটি গ্রামের নাম 'সোনাহাতু'। সাঁওতালি ভাষায় 'সামানখ' হল স্বর্ণজ্ঞাপক শব্দ। কোলীয় ভাষাভাষীদের কাছে 'সোনা' শব্দের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। যেমন- সনামুখী, সনামুই, সোনাকোনিয়া ইত্যাদি। তেমনি সুবর্ণরেখা। 'সুবর্ণ' অর্থ 'সোনা'। যেন সোনার মত দামি এই নদীর চলাচল। ড. বঙ্কিম মাইতির কথায়, 'সুবর্ণরেখা হিরণ্যগর্ভা। তার বালুদেহে অভ্র স্বর্ণ কণার ঝিকিমিকি। সে মানুষকে উদাসী বাউল করে না। মানুষী প্রেমের রক্তরাগ ছড়িয়ে কাছে টানে। তার বালুশয্যায় আছে দেহ মিলনের আহ্বান, রোমান্টিক মুগ্ধতার গুঞ্জরণ। আবাহন ও আত্মীকরণ, গ্রহণ ও স্বীকরণ, পরবাসী পরজনের কুটুম্বীকরণ- সুবর্ণরেখা নদীর তটের চিত্তসত্ত্বা'।এই বিস্তৃত নদী পথে তাই নানা সংস্কৃতি থাকাটাই স্বাভাবিক।

সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী জনজীবনের ভাষা এবং সংস্কৃতি নিয়ে 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাস লিখে আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন নলিনী বেরা। মূলত তিনটি কথ্য ভাষা এই সুবর্ণরৈখিক এলাকায় মেলে। কোলীয় ভাষা মিশ্রিত ঝাড়খণ্ডী বাংলা তথা ভূমিজ, মাহাতোদের ভাষা, সাঁওতালি, মুণ্ডারী, কোলীয় ভাষা এবং কিছু উওরাঞ্চলীয় ওড়িআ, সুবর্ণরৈখিক বাংলা ভাষা। এই ত্রিধারার সমন্বয়ে সুবর্ণরেখা বহন করে চলেছে একটা আপাত সুন্দর ভাষাগত সংস্কৃতি। পিস্কাতে শুরু হয়ে সুবর্ণরেখা কিছুদুর গিয়ে আটকে পড়েছে গেতুলসুদ ড্যামে। গেতুলসুদ ড্যামটি সুবর্ণরেখার উৎস থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। রাঁচি থেকে ড্যামের দূরত্ব চল্লিশ কিলোমিটার। সুবর্ণরেখার জলে ১১৬ফুট ড্যামটি তৈরি হয় ১৯৭১ সালে। রাঁচি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার পানীয় জলের উৎস এই গেতুলসূদ ড্যাম। ড্যাম থেকে বেরিয়ে পথে হড্রু ফলসে ৯৮মিটার নীচে পড়েছে সুবর্ণরেখা। তারপর জামশেদপুর, চাণ্ডিল, ঘাটশিলা, গোপীবল্লভপুর, তাসরাঘাট, গরদপুর, সোনাকনিয়া হয়ে ওড়িশায় ঢুকে জলেশ্বরের পাশ দিয়ে তালসারির মোহনায় পড়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। অনেক সংস্কৃতি, উৎসব, ধর্মীয় লোকবিশ্বাস এই সুবর্ণরেখাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী সুবর্ণরেখার গতিপথের কিছুটা অংশ পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার সীমারেখা স্পর্শ করেছে। সেই অংশে একদিকে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর ও অপর দিকে রয়েছে ওড়িশার বালেশ্বর। ফলত এই অঞ্চল গুলিতে গড়ে উঠেছে বঙ্গোৎকলের মিশ্র সংস্কৃতি। বিশিষ্ট অধ্যাপক ড.কৃষ্ণচন্দ্র ভূঁঞার লেখা ভুবনেশ্বরের পশ্চিমা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'সুবর্ণরেখার এপারি সেপারি' বইটিতে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা মিশ্র সংস্কৃতির উল্লেখ রয়েছে। 'সুবর্ণরেখার এপারি সেপারি' যার বাংলা অর্থ সুবর্ণরেখার এপার ওপার। নদী কিভাবে সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত ভাবে প্রভাব ফেলে, কিভাবে বদলে যায় সেই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, আর কি ভাবেই বা গড়ে ওঠে সংস্কৃতির মিশ্রণ, তা তুলে ধরেছেন

ড.ভূঁঞা। ড.ভূঁঞা উল্লেখ করেছেন যখন প্রতি বছর বন্যা হয়, সুবর্ণরেখার দুকুল ছাপিয়ে নদীর জল প্লাবিত করে পাশ্ববর্তী গ্রাম গুলিকে, তখন আর এই অঞ্চলের ভিন্নতা চোখে পড়ে না। রাজনৈতিক ভাবে আলাদা রাজ্য হলেও সকলেই তখন একত্রিত ভাবে লড়াই করেন সেই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। এই একতা যে শুধু প্রাকৃতিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে জারি থাকে তা নয়, বিভিন্ন পর্ব-পার্বনেও মিলিত হন সকলে। রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠানে ফুটে ওঠে বঙ্গোৎকলের ছাপ।

লেখক সুদর্শন নন্দী তার 'বর্ণময়ী সুবর্ণরেখা' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন এই অঞ্চলের একটি বিশেষ পর্ব মকর উৎসবের কথা। এই উৎসবের মূল নদী সুবর্ণরেখা। মূলত ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানায় বিশাল এলাকা জুড়ে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে সুবর্ণরেখার তীরে বসে 'বালিযাত্রা' মেলা। পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে এই দিন ছাতু ভোগ অর্পণ করা হয়। দলে দলে মানুষ তাদের লোকবিশ্বাস নিয়ে উপস্থিত হন সুবর্ণরেখার তীরে পিতৃপুরুষকে স্মরণের উদ্দেশ্যে। এই রীতি উপলক্ষে নদীর তীরে মেলা বসে যা বালিযাত্রা নামে পরিচিত।

লোকসংস্কৃতির গবেষক মধুপ দের লেখা থেকে জানা যায়, বালিযাত্রা মেলা শুধু সুবর্ণরেখা নদীর তীরেই অনুষ্ঠিত হয় না। সুবর্ণরেখা নদী পশ্চিমে যেখানে ঝাড়খণ্ড থেকে বাংলায় ঢুকেছে সেখানে করবণিয়া গ্রামের কাছে মূল বালিযাত্রা মেলাটি বসে। কিন্তু সুবর্ণরেখা নদী পূর্বে যেখানে বাংলা থেকে ওড়িশায় ঢুকেছে সেই সব স্থান থেকে ৬০-৬২ কিলোমিটার দূরে করবণিয়ার মূল বালিযাত্রার স্থানে সকলে আসতে পারেন না বলে নদীর তীরে ছোট ছোট অনেক বালিযাত্রা মেলা হয়। দাঁতনের গরদপুর, সোনাকাণিয়া এবং বেলামূলাতে, কেশিয়াড়ির ভসরাঘাটে এবং ওড়িশার জলেশ্বরের রাজঘাট ও মাকরিয়ায় সুবর্ণরেখা নদীর তীরে চৈত্র সংক্রান্তির দিনেই বালিযাত্রার মেলা বসে। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী বলা হয় বালিযাত্রা তথা সুবর্ণরেখা নদীর সাথে মহাভারতের যোগ রয়েছে। চৈত্র সংক্রান্তিকে এই অঞ্চলের মানুষেরা বলেন বিষুব সংক্রান্তি। এই দিন গাজনের মেলাও বসে মেদিনীপুর সহ জলেশ্বর, বালেশ্বর ও চন্দনেশ্বরের বেশ কিছু গ্রামে। চন্দনেশ্বর মন্দিরে বাবা চন্দনেশ্বরের কাছে ভীড় জমান জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বহু মানুষ। চরক পুজোও হয় বহু স্থানে। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ এই অঞ্চলের বেশ কিছু দেব মন্দিরের গঠন শৈলীতে বঙ্গীয় রীতির প্রতিফলন দেখা যায়। উৎকলের রাজা লঙ্গুলা নরসিংহদেবের সময় বেশ কিছু মন্দির প্রতিষ্ঠা হলেও কিছু মন্দিরের গঠন শৈলীতে গম্বুজাকৃতি চূড়া বঙ্গীয় নিদর্শনের বার্তা দেয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চন্দনেশ্বর বাবার মন্দির। যদিও সারা ওড়িশায় এই রকম গঠন শৈলী বেশ বিরল। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ঐতিহ্য বিশারদ ড. সুরেন্দ্র কুমার মিশ্র তাঁর 'ওড্র দেশের ইতিহাস' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

এই অঞ্চলের মানুষেরা কার্তিক পূর্ণিমা বা রাস পূর্ণিমাকে বলেন 'ডঙ্গা পূর্ণিমা'। এই দিন লোককথা অনুযায়ী উপকূলীয় অঞ্চলে ওড়িয়া বীর পুত্রদের বাণিজ্য যাত্রা শুরু হয় ফলত তাদের মঙ্গল কামনায় ইষ্টদেবীর উদ্দেশ্যে নদীতে নৌকা ভাষানোর পরম্পরা রয়েছে। এই দিন করা গাছের চোঙা দিয়ে নৌকা বানিয়ে তাতে আতপ চাল, ধুপ, প্রদীপ, ফুল, ফল এসব দিয়ে পরিবারের মঙ্গল কামনায় সূর্যোদয়ের আগে নৌকা ভাষানো হয়। এতো গেল পর্বপার্বনের কথা, ভাষার দিক থেকেও এই অঞ্চলের ভিন্নতা নজরে পড়ে। আগে বালেশ্বর ও মেদিনীপুরের মধ্যে কোনো সীমিরেখাগত পার্থক্য ছিল না। ১৯৩৬ সালে ওড়িশা স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে মান্যতা পাওয়ার পর রাজনৈতিক সীমারেখা তৈরি হলেও তা অদৃশ্য হয়েই থেকে গিয়েছে। কারণ এখনও এই অঞ্চলের মানুষের সামাজিক সংহতি, সহাবস্থান ও একতা রন্ধে রন্ধে উপলব্ধি করা যায়। বাংলা ও ওড়িআ ভাষার মিশ্রণ নজরে পড়ে এই অঞ্চলের মানুষের কথায়।

.

বাংলা ও ওড়িআ ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে বলে রাখি দুটি বানান বিভ্রাটের কথা। ওড়িআ ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করার সময় থেকেই এটা আমি লক্ষ্য করেছি। আমরা বাংলা বানানে লিখি 'উড়িয়া' এবং 'উড়িষ্যা'। কিন্তু বাংলা লিপিতে এই বানান কতখানি সঠিক তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। ওড়িআ লিপিতে ওড়িশার মানুষ যে বানান লেখেন তা হল 'ওড়িআ' এবং 'ওড়িশা'। এই হল ভাষা ও রাজ্যের নাম। বাংলায় লিপান্তর(transcription) করার সময় আমরা এর পরিবর্তন করে নিয়েছি, এটা কখনোই আমি ব্যক্তিগত ভাবে সঠিক মনে করি না। তাই এখানে 'ওড়িআ' বানানটিই ব্যবহার করেছি। তবে যখন আমরা লিখি 'ওড়িশি নৃত্য' তখন আমরা মূল বানান অক্ষুন্ন রাখি। অন্যদিকে একই ধরনের বানান বিভ্রাট বাংলা সম্পর্কে ওড়িআ লিপান্তরেও দেখা যায়। ওড়িআ ভাষায় লেখা হয় 'বঙ্গলা'। ওড়িআতে এর উচ্চারণ বঙ্গড়া এবং ওড়িআতে মূর্ধা-'ল' ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ওড়িআ লিপিতেও 'বাংলা' বানানেরই লিপান্তর হওয়া উচিত। আমরা তামিলকে তামিল লিখেছি, মারাঠীকে মারাঠী লিখেছি কিন্তু ওড়িআর ক্ষেত্রে উড়িয়া এবং উড়িষ্যা লিখব কেন? একই যুক্তিতে বাংলা, ইংরেজিতে হয়েছে'বেঙ্গলি'(Bengali)। ইংরেজরা যতদিন বলেছে বলেছে। কিন্তু স্বাধীনতার এতদিন পর আমরাও কেমন বেঙ্গলিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কেন? 'Department of Bangla' লিখতে দোষ কোথায়? এই বিষয়ে অধ্যাপক শেখ মকবুল ইসলাম 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

একসময় ওড়িআ ভাষার স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবিতে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ব্যাস কবি ফকির মোহন সেনাপতি। কান্তিচরণ ভট্টাচার্যের মতো মানুষ যারা ওড়িআ কোনো ভাষা নয়, ওড়িআ বাংলার অপভ্রংশ বলে প্রচার করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ফকির মোহন সেনাপতির মত মানুষেরা গড়ে তুলেছিলেন 'ওড়িআ ভাষা বাঁচাও কমিটি'। বর্তমানে বাংলা ও ওড়িআ দুটি ভাষাই স্বতন্ত্র স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে এই সুবর্ণরৈখিক অঞ্চলের মানুষের ভাষায় রয়েছে মিশ্রতা। যাকে বিশুদ্ধ ওড়িআ বা বাংলা কোনোটাই বলা যাবে না। কিন্তু দুটি ভাষার প্রভাবে যে মিশ্র ভাষা গঠিত হয়েছে তাকে বলা যেতে পারে সুবর্ণরৈখিক ভাষা। উদাহরণ স্বরুপ ইংরেজি শব্দ 'why' যার বাংলা অর্থ 'কেন', একে ওড়িআতে বলা হয় 'কাহিঁকি', তবে এই অঞ্চলের মানুষেরা বলেন 'কেনে'। আবার ইংরেজি শব্দ 'girl', যার বাংলা অর্থ 'মেয়ে', ওড়িআতে বলা হয় 'ঝিঅ', কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষেরা বলেন 'ঝঁউরি'। ইংরেজি শব্দ 'child', যার বাংলা অর্থ 'বাচ্চা' বা 'শিশু', ওড়িআতে বলা হয় 'ছুঁআ'। কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষেরা বলেন 'ছানা'। এই রূপ একাধিক ভিন্নতা লক্ষনীয়। ফলত এই ভাষা কখনোই ওড়িআ বা বাংলা না হলেও তার প্রভাব বর্জিত তা কিন্তু বলা যাবেনা। সুবর্ণরেখা এই অঞ্চলের মানুষের কাছে শুধু একটি নদী নয়। সুবর্ণরেখা এক সোনার জীবনরেখাও বটে। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, পরম্পরায় এই নদী মানুষের জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত তাই তার গুরুত্বের গভীরতাও বেশ উল্লেখনীয়।

Bibliography:

1. Bera, Nalini. *Subarnarenu Subarnarekha.* Dey's Publishing, Kolkata, 2018.
2. Bhunia, Krishnachandra. *Subarnarekhar Epari Separi.* Pashchima Prakashani, Bhubaneswar, 1990.
3. Giri, Satyaboti. Samaresh Majumder. *Prabandha Sanchayan.* Islam, Sk. Makbul. Tulana : tattwik prekshit, bangla-odia probad ebong Sarala Das o Kashiram Daser mohavarat, Ratnaboli, Kolkata, 2006.
4. Maity, Bankim. *Subarnarekha Abobahikay Lokayat Sangskriti.* Pustak Bipani, Kolkata, 2018.
5. Mishra, Surendra Kumar. *Odra Deshara Itihasa.* Rupambika Prakashan, Cuttack, 2008.

লেখক পরিচিতি:

শ্রেয়া হালদার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক এবং তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করার পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে বি.এড পাশ করেন। বর্তমানে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত রয়েছেন। তাঁর ওড়িআ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকেই ওড়িআ থেকে বাংলা এবং বাংলা থেকে ওড়িআ ভাষায় অনুবাদের কলম ধরা শুরু। তাঁর অনূদিত গ্রন্থ গুলি হল 'শ্রীজগন্নাথ : ঐতিহ্য শতক', 'শ্রীজগন্নাথদেবের অনবসরে শ্রীঅলারনাথ', 'পুরীর সাহিযাত্রা', 'শ্রীমন্দিরে শিল্পসেবা' 'নবকলেবরের ঐতিহ্য', 'মহোদধির মহাতীর্থ স্বর্গদ্বার', 'শ্রীজগন্নাথ অনুভব', 'শ্রীজগন্নাথ চেতনাঃ সংহতির স্বরলিপি' প্রভৃতি। এছাড়াও তাঁর দুটি অনূদিত উপন্যাস হল 'সঙ্গম' ও 'শ্রীঝরা'। ওড়িশার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে তাঁর একাধিক লিখিত প্রবন্ধ ও কবিতা বিভিন্ন সময়ে বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

CC BY NC